Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ৯ নভেম্বর, ২০২১

৪৪ বর্ষ ৪১ সংখ্যা ৮ নভেম্বর, ২০২১, সোমবার, ২১ কার্তিক, ১৪২৮

নভেম্বর বিপ্লব দিবস উদযাপিত

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৭ নভেম্বর : মহান নভেম্বর বিপ্লবের স্মরণে ৭ নভেম্বর রবিবার জেলার বিভিন্ন স্থানে যথোচিত মর্যাদায় নভেম্বর বিপ্লব দিবস পালন করা হয়। এই উপলক্ষে জেলার বিভিন্ন স্থানে বামপন্থী কর্মী ও সমর্থকরা উপস্থিত হয়ে পতাকা উত্তোলন ও শহিদ বেদিতে পুষ্পার্পণ করেন। নভেম্বর বিপ্লব দিবস পালনে ছাত্র-যুবদের অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন স্থানে সমবেত উৎসাহীদের কাছে নভেম্বর বিপ্লবের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন স্থানীয় নেতৃত্ব।

সিপিআই(এম) পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির অফিস সাহেদুল্লাহ বিজয় ভবনে রক্ত পতাকা উত্তোলন করেন জেলা সম্পাদক অচিন্ত্য মল্লিক। অমল হালদার, অরিন্দম কোঙার, তাপস সরকার, সাইদুল হক, নজরুল ইসলাম, তরুণ রায়, আলমগীর মণ্ডল, সুপর্ণা ব্যানার্জী সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন গণসংগঠনের কর্মীবৃন্দ অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন। সিটু, কৃষকসভা ও খেতমজুর ইউনিয়নের অফিসেও পতাকা উত্তোলন ও শহিদ বেদিতে মাল্যদান কর্মসূচি পালিত হয়। জেলা জুড়ে পালিত অনুষ্ঠানে অনেক মানুষের অংশগ্রহণ লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ায় ১৯১৭ সালে যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাধিক হয়েছিল তার প্রাসঙ্গিকতা নতুন করে চিহ্নিত করল। কাটোয়া, কালনা, মেমারি, রায়না, খণ্ডঘোষ, সদর, গলসী, ভাতাড় সহ সমস্ত পার্টি অফিসেই দিনটি পালিত হয়।

প্রয়াত প্রাক্তন বিধায়ক অধ্যাপক রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

নিজস্ব সংবাদদাতা : কিডনির সমস্যায় আক্রান্ত হয়ে হঠাৎই ২ নভেম্বর সন্ধ্যায় ৮২ বছর বয়সে প্রয়াত হলেন বর্ধমান দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের দু'বারের বিধায়ক, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কারিগরি ও জৈবপ্রযুক্তি বিভাগের প্রাক্তন মন্ত্রী ও বিডিএ-র চেয়ারম্যান অধ্যাপক রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে আসার আগে তিনি দীর্ঘকাল বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। ২০১১ ও ২০১৬ সালে বর্ধমান দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে বিজয়ী হলেও ২০২১ সালের নির্বাচনে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি। সিপিআই(এম) নেতা নিরুপম সেনের মৃত্যুর পর বর্ধমান জেলা পার্টি অফিসে তাঁর মরদেহে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে তিনি বিরল রাজনৈতিক সৌজন্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। রবিরঞ্জনবাবুর মরদেহ বর্ধমানে আনা হয়নি, কলকাতায় শেষকৃত্য হয়।

সত্যজিৎ রায়ের জন্মশতবার্ষিকী স্মরণে শ্রদ্ধা জানাতে বিডিএ-র এক অভিনব উদ্যোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২ নভেম্বর : আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চলচ্চিত্র পরিচালক ও মহান শিল্পী সত্যজিৎ রায়ের জন্মশতবার্ষিকী স্মরণে বিডিএ এক অভিনব উদ্যোগ নেয়। ১৬টি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সিনেমাকে তুলে ধরতে কার্জনগেটে ১৬টি বাতিস্তম্ভে পোস্টার ও আলোকসজ্জায় তুলে ধরা হয়। এই অভিনব উদ্যোগ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন সত্যজিৎ রায়ের পুত্র সন্দীপ রায়। 'রায় সোসাইটি' সার্বিকভাবে সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসে। অনুষ্ঠান চলবে মৃত্যুদিন ২ মে পর্যন্ত। আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে রায় সোসাইটির পক্ষ থেকে সন্দীপ রায় জানান, ''বাবার সঙ্গে বর্ধমানে অনেক শুটিং এ এসেছি। ফলে বর্ধমানের সঙ্গে আমার আত্মিক যোগাযোগ গড়ে উঠেছে। বাবা 'পথের পাঁচালী' শুটিং করতে পালসিটে আসেন, চকদিঘিতে 'ঘরে বাইরে' শুটিং-এ মাসাধিক কাল কাটিয়েছেন। একারণেই বিডিএ-র এই উদ্যোগের প্রস্তাব লুফে নিয়েছি।'' সাংবাদিক সম্মেলনে নানান প্রশ্নের উত্তরে শ্রী রায় জানান, ''যতই টিভি, মোবাইলের দাপট বাড়ুক না কেন, বড়ো পর্দার কদর থেকে যাবে। তবে কষ্টের ব্যাপার হলো হলগুলি বন্ধ হওয়ায় মাল্টিপ্লেক্স ছাড়া দেখার উপায় নেই। যা খুবই ব্যয়বহুল। সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে।'' ক্লাসিক ছবি না হওয়ার জন্য বর্তমান প্রযোজকদের দৃষ্টিভঙ্গিকে তিনি দায়ী করেন। দর্শকদের রুচিও পাল্টে গেছে। তবে এখনো ক্লাসিক ছবির দর্শক আছে।

এদিন বিডিএ-র শ্রী অরবিন্দ সভাঘরে সাংবাদিকদের আন্তর্জাতিক ছবি 'অপুর সংসার', 'গুপি গাইন বাঘা বাইন', 'নায়ক', 'ঘরে বাইরে', 'পথের পাঁচালী' সহ ১৬টি বাছাই ছবির কোলাজ পর্দায় দেখানো হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন রায় সোসাইটির সদস্য ছাড়া বিডিএ-র নির্বাহী আধিকারিক শান্তনু বসু, জেলা তথ্য আধিকারিক কুশল চক্রবর্তী সহ জেলার আধিকারিকরা।

মার্কসীয় সাহিত্যের বুক স্টল মেমারির আমাদপুরে

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি ৫ নভেম্বর : সিপিআই(এম)-এর মেমারি-১ পশ্চিম এরিয়া কমিটির আমাদপুর শাখার উদ্যোগে আমাদপুরের বিখ্যাত কালীপূজা উপলক্ষে বৃহস্পতিবার বিকেলে একটি বুক স্টল খোলা হয়। প্রত্যেক বছরের ন্যায় এবারও বই কেনার ও বই দেখার ব্যাপক ভিড় হয় এই মার্কসীয় সাহিত্য বুক স্টলে। মার্কসীয় সাহিত্য ছাড়াও অন্যান্য পত্র-পত্রিকা সহ বিজ্ঞান মনস্কতার ও ছোটদের বই বিক্রি হয়েছে এই স্টলে। দুই দিনে প্রায় ১৮৫০ টাকার বই বিক্রি হয়েছে। স্টলে উপস্থিত ছিলেন সঞ্জয় দেব, আওলিয়া মণ্ডল, সেখ ফজল আলি, তাপস দে প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

'নাড়া পোড়ানো বিরোধী দিবস' পালনের পাশাপাশি চলছে নাড়া পোড়ানোও

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৩ নভেম্বর : পশ্চিমবঙ্গ কৃষি দপ্তর থেকে ৩ নভেম্বর 'নাড়া পোড়া বিরোধী দিবস' পালিত হয়। পরিবেশের উপর নাড়া পোড়ানোর বিরূপ প্রভাব নিয়ে মানুষকে সচেতন করা হয়। কিন্তু এতে চেতনা ফেরেনি, মাঠে মাঠে এদিন নাড়া পোড়ানোর ছবি ধরা পড়ে। পূর্ব বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কৃষিপ্রধান মহকুমার মধ্যে অন্যতম কালনা। এই মহকুমার পাঁচটি ব্লকই কৃষিতে সমৃদ্ধ। খরিফ মরশুমের ধান ইতিমধ্যেই উঠতে শুরু করেছে। খেতমজুর দিয়ে ধান না কেটে, আর্থিক লাভের জন্য কৃষকরা মাঠে যন্ত্র নামিয়ে ধান কাটছেন। জমিতেই পড়ে থাকা খড় বা নাড়া শুকিয়ে যাওয়ার পর আগুন লাগিয়ে দিচ্ছেন। কৃষি দপ্তর এরই বিরুদ্ধে নিয়মিত প্রচার চালাচ্ছে। বুধবার তো ছিল 'নাড়া পোড়া বিরোধী দিবস'। কৃষকদের সচেতন করতে বিভিন্ন জায়গায় প্রচার চালায় কৃষি দপ্তর। এই দপ্তর থেকে বলা হয়— নাড়া পোড়ালে ক্ষতিকারক গ্যাস, তাপ, ধোঁয়া, ছাইকণা উৎপন্ন হয়। যা উষ্ণায়ণকে ডেকে আনে। আর বিশ্ব উষ্ণায়ণে অত্যধিক গরম, অনাবৃষ্টি, বন্যা, শীত কমে যাওয়া, পাহাড়ের বরফ গলে জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি অস্বাভাবিক আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়। জমির মাটির উপরের অংশ প্রচণ্ড শক্ত হয়ে যায়। জৈব পদার্থ ও উদ্ভিদ, মাটির বহু উপকারী জীবাণুর মৃত্যু ঘটে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবেশ মন্ত্রকের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে ধানের জমিতে খড় বা নাড়া পোড়ানো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কৃষি দপ্তরের সহযোগিতা ও পরামর্শ মেনে খড় না পুড়িয়ে বিভিন্ন যন্ত্রের সাহায্যে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে। এতে জমির উর্বরতা ও জল ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। জমি ছাড়াও এই খড় অন্যভাবেও ব্যবহার করা যেতে পারে। মাটির স্বাস্থ্য বজায় রেখে অধিক ফলন পেতে এবং দূষণমুক্ত পরিবেশ বজায় রাখতে খড় পোড়ানো যাবেনা। পরিবেশ বজায় রাখতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে কৃষকদের আহ্বান জানিয়েছে কৃষি দপ্তর।

শিক্ষকনেতার জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৪ নভেম্বর : কালনার শিক্ষকনেতা অমরেন্দ্রনাথ সরকার (৭৮)-এর জীবনাবসান হয়েছে। কলকাতার এসএসকেএম (পিজি) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ৪ নভেম্বর সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বেশ কিছুদিন ধরেই বিভিন্ন রোগে ভুগছিলেন তিনি। কয়েকদিন

—এরপর চারের পাতায়

ধানের দাম—ক্ষতির সম্ভাবনা

নিজস্ব সংবদদাতা, বর্ধমান, ৩ নভেম্বর : ধান কেনার জন্য যখন জেলা প্রশাসন মিটিং করছেন, ঠিক তখনই পাকা ধান বাঁচাবার লড়াই-এ সামিল চাষি। দুর্যোগের পর দুর্যোগ মোকাবেলা করে চাষির যখন দেওয়ালে পিঠ ঠেকার অবস্থা তখন মাঠকে মাঠ ঘোড়ামুখি ধান বাদামি শোষকের কবলে। ভাতারের চাষি গোলাম মর্তুজা জানালেন ১০ বিঘা জমি চাষ করেছিলাম। জল জমে দুবিঘা শেষ হয়েছে। বাকি ৮ বিঘা জমিতে কাস্তে যাবে না। বাদামি শোষক শুকনো খড় করে দিয়েছে। গাছ শুকিয়ে যাওয়ার জন্য ওষুধেও কাজ হচ্ছে না। গলসির চাষি সুকুমার সেন জানালেন এবার খরচের বহর যেভাবে বেড়ে চলেছে তাতে সরকারি দামে ধান বিক্রি করলেও লোকসান অবশ্যম্ভাবী। এবার এক বিঘা জমিতে ১৫০০০-১৬০০০ টাকা খরচ। সরকারি দাম সিপিসিতে দিলে ১৯৬০ টাকা কুইন্টাল। ডি পি সিতে দিলে ১৯৪০ টাকা। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় মূল্য কমিশন ঘোষণা করেছে ১৯৪০ টাকা। রাজ্য সরকার সাপোর্ট প্রাইস দেয় ২০ টাকা। যা দীর্ঘ ১০ বছর একই আছে। সাংবাদিকরা সাপোর্ট প্রাইস বাড়াবার প্রশ্ন করলে কেন্দ্রের ঘাড়ে দোষ চাপান মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। তিনি দুটি চালকলের বিরুদ্ধে বিধিভঙ্গের অভিযোগ করেন। এক বস্তা (৬০ কেজি)-র দাম ১১৬৪ টাকা। এক বিঘা জমিতে ১৪-১৫ বস্তা ধান হয়। সরকারি দাম হবে ১৬৩০ টাকা। এবার উৎপাদন যদি গড় ১০ বস্তা দাঁড়ায়, তাহলে দাম পাবে ১১৬০০ টাকা বিঘা পিছু। যেখানে বিঘাপিছু উৎপাদন খরচ ১৬০০০ টাকা। এবার জেলাতে ৩ লক্ষ হেক্টর জমিতে আমন চাষ হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের শস্যগোলা পূর্ব বর্ধমানের চাষিরা সিঁদুরের মেঘ দেখছে। গতবার বাদামি শোষক তেমন ক্ষতি করতে পারেনি। এবার উৎপাদন ঠেকবে তলানিতে। গতবার সরকার জেলায় ধান কিনেছিলো ৪ লক্ষাধিক মেট্রিক টন। জেলায় এবার ধান কেনার লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৬ লক্ষ মেট্রিক টন। ১১৫ টি রাইসমিল, সমবায় এবং সেলফ হেল্প গ্রুপ ও এফসিআই কিনবে। এব্যাপারে চালকল সমিতির জেলা সম্পাদক সুব্রত মণ্ডল জানান, যেহেতু ধান কিনতে এক মাস সময় আছে, তার মধ্যেই সমস্যা মিটে যাবে।

মাটির প্রদীপ নির্মাণ শিল্পের সংকট

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৪ নভেম্বর : বিশ্বায়নের যুগে কৃত্রিম জিনিসপত্রের দাপটে যখন চিরাচরিত জিনিসপত্রের ব্যবহার কমে যাচ্ছে, তখন পুজো-আর্চায় মাটির তৈজসপত্র তার চিরাচরিত জায়গা ধরে রেখেছিল। কিন্তু এবছর একে তো করোনা আবহ, তার উপরে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য তথা সরষের তেলের দাম আকাশচুম্বী হওয়ায় মাটির প্রদীপ নির্মাণ শিল্পের উপর বিরাট প্রভাব পড়েছে। কালনার পূর্ব সাতগাছিয়ার কুমোরপাড়ায় দেওয়ালিতে সেই ভাবে মাটির প্রদীপের বেচাকেনা বা অর্ডার পাওয়া যায়নি। তাইতো দেওয়ালির আগে প্রতি বছরের মতো এবার কুমোরপাড়ায় সেই রকম ব্যস্ততা দেখা যায়নি। এখানকার কারখানার মালিকরা জানান--এখানকার উৎপাদিত জিনিসপত্র কলকাতা, দুই চব্বিশ পরগনা, নদীয়া, বর্ধমান জেলার বিভিন্ন প্রান্তে যায়। নিজেদের উদ্যোগে পাঠানোয় পরিবহণ ব্যয় অধিক হওয়াতে সেরকমভাবে লাভ করা যায় না। এই সমস্যার সমাধানে মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ বলেছিলেন, সব কারখানার মালিককে নিয়ে ক্লাস্টার গঠন করা হবে। এই ক্লাস্টারের উৎপাদিত মাল বিশ্ববাংলা বিপণন কেন্দ্রের মাধ্যমে বাংলা জুড়ে বিক্রি করা হবে। কিন্তু সেই কথা কথাতেই থেকে গেছে, বাস্তবের রূপ পায়নি।

নতুন চিঠি

৮ নভেম্বর, ২০২১

উপনির্বাচনের ফল ও সংকেত

২০২১ সালের অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে দেশে ৩টি লোকসভা ও ১৩ রাজ্যের ২৯টি বিধানসভা উপ-নির্বাচন হয়ে গেল। দেওয়ালির আগে তার ফলও প্রকাশিত হল। এই ফল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। লোকসভার তিনটি আসনের মধ্যে দুটিতে বিজেপি পরাজিত হয়েছে, ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে কেবলমাত্র মধ্যপ্রদেশের খাণ্ডুয়া কেন্দ্রটি। রাজ্যে শাসনক্ষমতায় থেকেও হিমাচল প্রদেশের মান্ডি লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপির হার লজ্জাজনক। দাদরা নগর হাভেলি লোকসভা কেন্দ্রেও শিবসেনার কাছে বিজেপির হার শোচনীয়, কারণ এই কেন্দ্রে প্রার্থী ছিলেন বিজেপির অত্যাচারে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হওয়া প্রয়াত দেলকারের স্ত্রী। বিধানসভার উপ-নির্বাচনেও বিজেপির ফল বেশ খারাপ। কেবলমাত্র উত্তরপূর্বের আসাম, মিজোরাম ও মেঘালয় ছাড়া কোথাও বিজেপি তেমন সুবিধা করতে পারেনি। পশ্চিমবঙ্গে চারটি কেন্দ্রেই তারা পরাজিত হয়েছে শুধু তাই নয়, তাদের ভোট-শতাংশ এক ধাক্কায় অনেক নেমে গেছে। রাজ্যে ক্ষমতায় থেকেও কর্ণাটকে হাঙ্গাল কেন্দ্রে বিজেপি কংগ্রেসের কাছে হার মানতে বাধ্য হয়েছে। হরিয়ানায় ইলিনাবাদে আই.এন. লোকদল প্রার্থী চৌতালার কাছে ধরাশায়ী হয়েছে বিজেপি প্রার্থী। পক্ষান্তরে কংগ্রেস শুধু রাজস্থানের বল্লভনগরের আসন ধরে রাখেনি, ধারিয়াবাদের আসন বিজেপির কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছে। মধ্যপ্রদেশে তিনটি বিধানসভা আসনের একটিতে জিতেছে তাই নয়, তাদের প্রাপ্ত ভোটের শতাংশ (৪৫.৫) বিজেপির চেয়ে মাত্র ২ শতাংশ কম। বিহারের ২টি আসনে আরজেডি জিততে না-পারলেও তাদের ভোট-শতাংশ অনেক বেড়েছে।

এই ফলাফল বিশ্লেষণ করলে যেটা পরিষ্কার হয়ে যায় তা হল—মাহাত্ম্যপ্রচারের ঢক্কানিনাদ সত্ত্বেও বিজেপির বাহারি-রং খসে খড়-মাটি বেরোতে শুরু করেছে। যে রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় রয়েছে সেখানেও মানুষকে হিন্দুত্বের ললিপপ দিয়ে বাগে আনা যাচ্ছে না। হিমাচল প্রদেশে সামনের বছর বিধানসভা ভোট। এই অবস্থায় বিজেপির শক্তিক্ষয় বিজেপি নামক অপশক্তিকে যে রোখা সম্ভব তারই ইঙ্গিত দিচ্ছে। বস্তুত, সাধারণ মানুষের রুটি-রুজির দাবিকে অস্বীকার করে, জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে, দেশের সম্পদ সাঙাৎ-ধনপতিদের হাতে তুলে দিয়ে এবং সংবিধানপ্রদত্ত বিধানকে উপেক্ষা করে সাম্প্রদায়িক বিভাজন করার যে অন্যায় বিজেপি করে চলেছে, তা দেশবাসী যে ভালো চোখে দেখছে না, উপনির্বাচনের ফলাফল থেকে তা বেশ স্পষ্ট। তাছাড়া দেশব্যাপী কৃষক আন্দোলনের প্রতি সমর্থনে পদত্যাগকারী চৌতালার জয়, কৃষক আন্দোলনের নৈতিক জয় সূচিত করছে।

এই উপ-নির্বাচনের ফলের আর একটি বড় বৈশিষ্ট্য আঞ্চলিক দলগুলির নিজ দুর্গ দখলে রাখার সাফল্য। সর্বভারতীয় দলের মধ্যে একমাত্র কংগ্রেসই নিজ খাসতালুকের বাইরে কিছুটা সাফল্য পেয়েছে। তাই এই উপনির্বাচন যদি সেমি-ফাইনাল হয়, কংগ্রেস সমেত সমস্ত আঞ্চলিক দলগুলিকে মানুষের জীবন-জীবিকার সমস্যা সমাধানে কর্মসূচিগত মতৈক্য তৈরি করে ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির বিরুদ্ধে ঝাঁপাতে হবে। কিন্তু মুখে ঐক্যের কথা বলে বিজেপি-বিরোধী আঞ্চলিক শক্তিকে মদত না দিয়ে তাকে দুর্বল করার চেষ্টা হলে, তৃণমূল যেমনটা শুরু করেছে ত্রিপুরায় ও গোয়ায়, সবকিছু ধ্বংস হওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা।

পাতা ফাঁদে আটকে পড়লো বাঘরোল

নিজস্ব সংবাদদাতা : আদিবাসীদের পাতা ফাঁদে আটকে পড়লো বাঘরোল (Fishing Cat)। যাকে গ্রামের মানুষ বলে মেছো বিড়াল বা হুমো বিড়াল। কে বা কারা এই ফাঁদ পেতে মেছো বিড়ালকে (বাঘের মতো) ধরেছে তা নিয়ে এলাকার মানুষ ধন্দে। প্রাণীটিকে দেখতে ব্যাপক মানুষের ভিড় জমে যায়। এলাকা সূত্রে জানা যায় পোলট্রি ফার্মের মালিকরা এর সঙ্গে যুক্ত। গত কয়েকদিন ধরে ফার্মগুলিতে মুরগি ধরে খেয়ে নিচ্ছিল কোনো জন্তুতে। তাকে ধরতেই তাই এই ফাঁদ পাতা হয়।

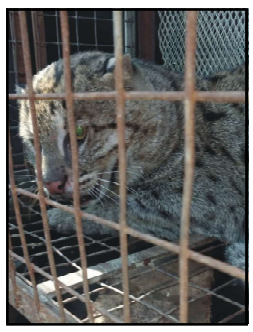

ভাতার থানার এড়াচিয়া গ্রামে বাঘরোল উদ্ধারে গিয়ে বনদপ্তরের কর্মীরা এই অনৈতিক কাজের সঙ্গে কারা যুক্ত সে বিষয়ে জানতে চাইলে এলাকাবাসী মুখে কুলুপ এঁটেছে। বনদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, বনদপ্তরের অনুমতি ছাড়া কোনো বন্যপ্রাণীকে খাঁচাবন্দি করা বা ধরা সম্পূর্ণ অবৈধ, দণ্ডনীয় অপরাধ। তা সত্ত্বেও কে বা কারা গ্রামের ধারে বাঁধের পাশে রীতিমতো লোহার খাঁচায় মুরগির টোপ দিয়ে বাঘরোল ধরার পরিকল্পনা করেছিল তা নিয়ে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে বনদপ্তর।

বনদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, ২ নভেম্বর এড়াচিয়া আদিবাসী পাড়ার কয়েকজন সকালে শৌচকর্ম করতে গিয়ে খাঁচার মধ্যে একটি বাঘের মতো জন্তু আটকে থাকতে দেখতে পায়। এই খবর চাউর হতেই ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। প্রচুর মানুষ ভিড় জমায় সেই জন্তুটিকে দেখার জন্য। খবর দেওয়া হয় বর্ধমানে বনদপ্তরে। বনদপ্তরের উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে এসে খাঁচা সহ বাঘরোল টিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। বনদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, এই ধরণের খাঁচা বানানো ও বন্যপ্রাণী শিকার করা দণ্ডনীয় অপরাধ।

বাজার ও দরিদ্র মানুষ ঃ পরস্পরের শত্রু না সহায়ক শক্তি?

শান্তনু কুমার ঘোষ

নবম পর্ব

চরম আবহাওয়ার দরুন সমগ্র বিশ্ব-অর্থনীতি নানান ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। ভারতও সেই সমস্যার ঊর্ধ্বে নয়। এই প্রসঙ্গে IPCC-র সতর্কবাণীর কথাও আমাদের জানা। স্বভাবতই, এখন সময় হল সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সেই অনুসারে গৃহীত পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণের। সমস্ত দেশের সঙ্গে, ভারতবাসী হিসাবে আমরাও এ বিষয়ে সমানভাবে দায়বদ্ধ। বর্তমান পর্বের আলোচনা সেই পারা, না-পারার অনুমাননির্ভর ফলাফল সম্বন্ধীয়।

Deloitte Economics Institute একটি আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন প্রতিষ্ঠান। IPCC প্রস্তাবিত সমাধানকে ভিত্তি করে এই প্রতিষ্ঠানটি ভারত সহ বিশ্বের অনেক দেশ ও বিভিন্ন মহাদেশের পক্ষে বিশ্ব উষ্ণায়ণের জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে কীরূপ আর্থিক লাভ অর্জন করা সম্ভব তার এক সুনির্দিষ্ট খতিয়ান হাজির করেছে। বর্তমান পর্বের আলোচনা মূলত সেই প্রস্তাবের (India's turning point : How climate action can drive our economic future– August 2021) উপর ভিত্তি করেই রচিত।

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত ভারতের ক্ষেত্রেও অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম দোসর হল পরিবেশ দূষণ। ১৯৯০-৯১ সালে দেশের আর্থিক পুনর্গঠনের ফল হিসাবে আর্থিক উন্নয়ন যেমন ত্বরান্বিত হয়েছে, তেমনই সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে দূষণ এবং ধনবৈষম্য। দূষণের ক্ষেত্রে অবস্থা কেমন পর্যায়ে গেছে তা বোঝার জন্য বিশ্বের মোট কার্বন নিঃসরণের হিসাবে ভারতের অবদান বিবেচনা করা যেতে পারে। এ বিষয়ে সমগ্র বিশ্বের মধ্যে ভারতের স্থান তৃতীয় (৭ শতাংশ)। কিন্তু দূষণের প্রশ্নে ভারতের বর্তমান পরিস্থিতিতে উপনীত হওয়া খুবই সাম্প্রতিক কালের ঘটনা। ১৯৬০-এর দশকে যেখানে মাথাপিছু কার্বন নিঃসরণের পরিমাণ ছিল বাৎসরিক ০.৩২ মেট্রিক টন, সেখানে গত এক দশকের গড় হিসাব ধরলে মাথা পিছু নিঃসরণের পরিমাণ হল বাৎসরিক ১.৬২ মেট্রিক টন। আর্থিক ভাবে উন্নত জীবন যাত্রার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় হল বেশি বেশি শক্তি সম্পদের যোগান এবং তা বাস্তবায়িত করার জন্য দরকার হয় অতিরিক্ত পরিমাণে কয়লা ও খনিজ তেলের ব্যবহারের। ফলে বাড়তে থাকে দূষণ যা জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যার প্রধান কারণ। কাজেই সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে, ভারতের স্থিতিশীল অর্থনৈতিক উন্নয়নকে নিশ্চিত করতে হলে অত্যন্ত জরুরি প্রয়োজন হল দূষণের মাত্রাকে যথাযথ পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করা। Deloitte Economics Institute-এর তৈরি করা প্রতিবেদনেও সমাধান হিসাবে দ্রুত কার্বন নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব করা হয়েছে।

উল্লেখিত এই প্রতিবেদনটিতে দুটি পরস্পর-বিরোধী কৌশলের পর্যালোচনা করে হয়েছে— ক) কৌশলঃ কার্বন নিঃসরণের প্রশ্নে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত থাকা ও কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ না করা। তাহলে,এর ফলে ভারতীয় অর্থনীতির সম্ভাব্য পরিণতি ঠিক কেমন হতে পারে? খ) অন্যথায় বিকল্প কৌশল হল—প্যারিস চুক্তির কথা মাথায় রেখে ১.৫ ডিগ্রি কার্বন নিঃসরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সময়কাল হিসাবে ২০৭০ সালকে চিহ্নিত করা এবং তদনুসারে নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। প্রশ্ন হল—এর দরুন ভারতীয় অর্থনীতি কীভাবে প্রভাবিত হতে পারে? প্রতিবেদকগণ এই দুটি অবস্থার দরুন ভারতীয় অর্থনীতির সম্ভাব্য পরিণতির আভাস দিয়েছেন। লেখার পরবর্তী অংশে তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল।

কৌশল 'ক' ঃ ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর প্রায় পঁচাত্তরটি বসন্ত অতিক্রান্ত; কিন্তু এতদিনেও সে কৃষি কাজের জন্য অতিমাত্রায় জলবায়ু নির্ভরতা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়নি। কাজেই খরা, বন্যা ও চরম আবহাওয়ার দরুন কৃষি উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া এদেশের কৃষিজীবীদের একরকম বিকল্পহীন ভবিতব্য। শুধু তাই নয়। আবহাওয়ার চরম অবস্থার কারণে গ্রাম ও শহরে বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি ধ্বংস হওয়ার ঘটনা প্রতি বছর একাধিকবার ঘটে। কাজেই উৎপাদনের ক্ষতি, সম্পত্তি ধ্বংস হওয়া, স্বাস্থ্য হানির ঘটনা এবং সেই সঙ্গে দরিদ্র মানুষের রোজগার হারানো; সব মিলিয়ে জলবায়ুর খারাপ অবস্থার কারণে যে বিপুল আর্থিক ক্ষতির ঘটনা ভারতবাসীর জীবনের নিত্যসঙ্গী এবিষয়ে কোনও দ্বিমত নেই।

কৃষিক্ষেত্র এবং অন্য যে চারটি ক্ষেত্র ভারতের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ৮০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে সেগুলি হল— ১) সরকারি ও বেসরকারি পরিষেবা; ২) খুচরো ব্যবসা এবং পর্যটন শিল্প; ৩) নির্মাণ শিল্প; এবং ৪) পরিবহণ শিল্প। এই ক্ষেত্রগুলির কথা মাথায় রেখে উল্লেখিত প্রতিবেদনে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবকে বিশ্লেষণ করার জন্য যে বিষয়গুলিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে সেগুলি হল—১) শ্রমিকের উৎপাদনক্ষমতার হ্রাস; ২) নিম্ন অববাহিকা, তটভূমি সন্নিহিত ভূখণ্ড এবং অন্যান্য নিচু এলাকায় সমুদ্রের জলস্ফীতির দরুন বা বন্যার দরুন উৎপাদনযোগ্য ভূমির ক্ষতি; ৩) ক্রমাগত মূল্যবান সম্পত্তি ধ্বংস হওয়ার দরুন নতুন সম্পত্তির জন্য বিনিয়োগ তথা উপার্জন হ্রাস পাওয়া; ৪) মানুষের স্বাস্থ্যহানি ও জীবনযাত্রার মানের অবনমন; ৫) আন্তর্জাতিক ব্যবসা, বাণিজ্য, ভ্রমণ ইত্যাদি থেকে এবং পেশাগত উপার্জন থেকে প্রাপ্য আয়ের ব্যাপক ক্ষতি; ও ৬) কৃষিপণ্যের উৎপাদন এবং উৎপাদনশীলতা হ্রাস পাওয়া। আগামী পঞ্চাশ বছরে এই ক্ষেত্রগুলির ক্ষতির আনুমানিক পরিমাণ হল-৩৫ লক্ষ কোটি মার্কিন ডলার। অর্থাৎ, প্রতি ডলার ৭৫ টাকা হিসাবে ধরলে মোট ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায়—দুই হাজার ছয় শত পঁচিশ লক্ষ কোটি টাকা। এই ক্ষতি শতাংশের হিসাবে ধরলে-মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের বাৎসরিক গড় ৬ শতাংশ হারে ২০৫০ সাল পর্যন্ত এবং গড়ে ৯ শতাংশ হারে ২০৬০ সাল পর্যন্ত। শুধু তাই নয়। আবহাওয়ার উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ২০৫০ থেকে ২০৭০ সালের মধ্যে নিট ক্ষতির পরিমাণ প্রায় পাঁচগুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়া সম্ভব। পৃথকভাবে দেখলে ক্ষেত্রভিত্তিক আনুমানিক ক্ষতির হিসাবটি (মার্কিন ডলারে) হল—১) পরিষেবা- ১১ লক্ষ কোটি; ২) কারখানাজাত উৎপাদন-৫ লক্ষ কোটি; ৩) খুচরা ব্যবসা ও পর্যটন শিল্প-৮ লক্ষ কোটি; এবং ৪) কৃষি সহ অন্যান্য সব ক্ষেত্র মিলিত ভাবে ১১ লক্ষ কোটি। এই ক্ষতি হল জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে উদাসীন থাকার মাশুল। এখন দেখা যাক, এই সমস্যার সক্রিয় মোকাবিলার পরিণাম কী?

কৌশল 'খ' ঃ আমরা জানি যে প্যারিস চুক্তি অনুসারে দূষণের মাত্রা ১.৫ ডিগ্রি-র মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার জন্য একটা সময়সীমা নির্ধারণ করা সব দেশের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব; ভারতও এ বিষয়ে দায়বদ্ধ। বিশ্বের বহু দেশ এই কাজে নিজস্ব লক্ষ্য ঘোষণা করলেও, এই প্রবন্ধ রচনার সময় পর্যন্ত ভারতের পক্ষে তেমন কোনও উদ্যোগের কথা জানা যায়নি। তাই আলোচ্য প্রতিবেদনের নির্ধারিত সময়কাল অর্থাৎ ২০৭০ সালকে লক্ষ্য হিসাবে ধরে নিয়ে বর্তমান আলোচনা করা যেতে পারে।

প্রতিবেদনটিতে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে যে ভারতের মত উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে এই লক্ষ্য অর্জন করা অত্যন্ত কঠিন। কেননা একদিকে উন্নয়নের গতিকে ধরে রাখা, অন্যদিকে বিকল্প পদ্ধতির সাহায্যে ক্রমবর্ধমান শক্তি সম্পদের চাহিদা পূরণ—এই দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত পরিকল্পনা-ভিত্তিক উন্নয়নের কাজকে পরিচালনা করা। আলোচ্য প্রতিবেদন অনুসারে নির্দিষ্ট হারে কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের জন্য প্রয়োজন ক্রমান্বয়ে জীবাশ্ম থেকে প্রাপ্ত শক্তিসম্পদের ব্যবহার হ্রাস করা। এই প্রতিবেদনের প্রস্তাবিত ক্রমটি হল—১) ২০২০-৩০সাল-১০ শতাংশ; ২)২০৩০-৪০ সাল- ৫৬ শতাংশ; ৩) ২০৪০-৫০ সাল-৮৪ শতাংশ; ৪) ২০৫০-৬০ সাল -৯১ শতাংশ; এবং ৫) ২০৬০-৭০ সাল ৯৫ শতাংশ। স্বভাবতই, উল্লেখিত ক্রম অনুসারে বিকল্প শক্তিসম্পদের উৎপাদন সুনিশ্চিত করা একান্ত জরুরি। ফলে এই দ্বিমুখী কর্মকাণ্ডের দরুন উল্লেখিত ক্রমের প্রাথমিক পর্যায়ে ভারতের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের হারেও বিরূপ প্রভাব পড়বে এমনটাই আশা করা যায়। এই প্রস্তাব অনুসারে কার্বন নিঃসরণের অধ্যায়টিকে চারটি আর্থিক ক্রমে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম ভাগে ২০৩০ সাল পর্যন্ত মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন হ্রাস পাবে ১.৫ শতাংশ ও দ্বিতীয় ভাগে ২০৪০ সাল পর্যন্ত এই হ্রাসের পরিমাণ হবে ৩.১ শতাংশ। এরপর ২০৫০ সাল নাগাদ ৩ শতাংশ আর্থিক বৃদ্ধি হওয়ার কথা এবং তারপর ২০৭০ সালে এই বৃদ্ধি হতে পারে ৮.৩ শতাংশ।

সুতরাং, প্রতিবেদনের প্রস্তাব অনুসারে, ১.৫ ডিগ্রি কার্বন নিঃসরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা গেলে ২০৭০ সাল নাগাদ বর্তমান মুল্যে ১১ লক্ষ কোটি মার্কিন ডলারের সমতুল আর্থিক লাভ সম্ভব হতে পারে। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে দ্বিতীয় প্রস্তাবটির দরুন সুবিধা হল দুটি—১) প্রথম বিকল্পে উল্লেখিত ক্ষতির হাত থেকে অর্থনীতিকে রক্ষা করা এবং ২) ২০৭০ সাল নাগাদ উপরিউক্ত পরিমাণ আর্থিক লাভ অর্জন করা। অবশ্য এই আলোচনার মূল ভিত্তি হল প্রতিবেদন প্রস্তুতকারকদের গৃহীত অনুমানের ও আর্থিক পূর্বানুমানের যথার্থতা। তবে আর্থিক হিসাব গ্রহণ না করা গেলেও, জলবায়ু সমস্যার সমাধান করার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কোনও দ্বিমত থাকতে পারে না।

নভেম্বর বিপ্লব ও লেনিনের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন

অতনু হুই

মার্কস-এঙ্গেলস্ বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের তত্ত্বগত ভিত্তি স্থাপনের পাশাপাশি শ্রমিকশ্রেণির নিজস্ব সংগঠন গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। কমিউনিস্ট লিগ ছিল তারই পরিণতি। তারপর থেকে ইউরোপের দেশগুলিতে একে একে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে উঠতে থাকে।

'মার্কসবাদ আপ্তবাক্য নয়, কর্মের দিগদর্শন'—এঙ্গেলসের এই উপলব্ধিকে স্মরণে রেখে লেনিন সত্যিকারেই তা প্রতিপন্ন করতে মতাদর্শগতভাবে শক্তিশালী পার্টি গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন- পুঁজিবাদ তার প্রগতিশীলতা হারিয়েছে। তাই বর্তমান সময়টা বিপ্লবের জন্য শুধু প্রয়োজনীয় নয়, অবশ্যম্ভাবী। ১৮৯৮ খ্রিঃ থেকেই পার্টি গঠনে উদ্যোগী হন ভ্লাদিমির। অসংখ্য মত, পথ, বিভ্রান্তি মুক্ত হয়ে পার্টি গড়ে তুলতে তীব্র মতাদর্শগত সংগ্রাম করতে হয় লেনিনকে। প্লেখানভ থেকে মার্তভ হয়ে মেনশেভিকদের মতাদর্শগত সংগ্রামে পরাস্ত করেই অবশেষে জয়ী হন তিনি।

পার্টি তৈরির আগে লেনিন যে বিষয়ে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেন তা হলো—মানুষকে মাঠে নামিয়ে দিলেই হবে না। পার্টির লক্ষ্য ও আদর্শ অর্থাৎ পার্টি কী চায় তার সুস্পষ্টতার ভিত্তিতেই পার্টি গড়ে তুলতে হবে। তার প্রচার,তাকে আকর্ষণীয় করার শর্তেই একটি কেন্দ্রীভূত পার্টি গঠন করা সম্ভব। তাই পার্টি গঠনে নীতি প্রণয়নের ও 'গণতান্ত্রিক এককেন্দ্রিকতা'র নীতির বীজ তাঁর চিন্তার মধ্যে ছিল প্রথম থেকেই।

তিনি তাঁর চিন্তায়—গণতান্ত্রিক এককেন্দ্রীকরণকে দু ভাগে ভাগ করেন। তাতে যা দাঁড়ায়- এক) আদর্শগত কেন্দ্রিকতা। দুই) সাংগঠনিক কেন্দ্রিকতা। তবে তিনি মনে করতেন—আদর্শগত কেন্দ্রিকতার দৃঢ় ভিত্তির উপরেই গড়ে উঠবে সাংগঠনিক কেন্দ্রিকতা। পার্টি গঠনের আগে থেকেই এই বিষয়টিতে লেনিন গুরুত্ব দিয়েছিলেন সর্বাধিক।

লেনিন বুঝেছিলেন আদর্শগত কেন্দ্রিকতাকে যথাযথ ভাবে গড়ে তুলতে হলে, তত্ত্বগত বিভ্রান্তি দূর করতে হবে। তারজন্য চাই একটি পত্রিকা। আর এইজন্যই 'ইশক্রা' পত্রিকাতে ধারাবাহিক কলম চালিয়ে তিনি একাধারে পার্টির মতাদর্শগত ভিত্তি ও অন্যদিকে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার কাজ পুরোদমে চালিয়ে গিয়েছিলেন। মতাদর্শগত সংগ্রামই কমিউনিস্ট পার্টির প্রাণভ্রমরা। এই সময়ে ১৯০০-১৯০৫ ধারাবাহিক ভাবে লেনিনের লেখা প্রবন্ধগুলির উল্লেখ করতেই হয়। পরবর্তীকালে এই প্রবন্ধগুলি তিনটি মহামূল্যবান পুস্তক হিসাবে রাশিয়ার জনগণের কাছে হাজির হয়। কমিউনিস্ট পার্টি গঠনে এগুলি ছিলো অন্যতম প্রধান রূপরেখা। বিশ্বের যে কোন দেশের কমিউনিস্ট পার্টি আজও লেনিনের দেখানো সে পথেই হেঁটে চলেছে।

ইসক্রা পত্রিকা

'স্ফুলিঙ্গ থেকে আগুন জ্বলবে'—এই বিশ্বাসে লেনিন ইসক্রা পত্রিকাকে মতাদর্শগত সংগ্রামের কাজে ব্যবহার করেন। রুশ সোস্যাল ডেমক্রাটিক পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে লেনিনের সংগঠন সম্পর্কিত প্রস্তাব পরাজিত হলে তিনি এই পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীতে গরিষ্ঠতা নিয়ে এ প্রশ্নে মতাদর্শগত সংগ্রাম চালিয়ে যান।

এ প্রসঙ্গে তাঁর—'কী করতে হবে'? এবং 'এক পা আগে দু পা পিছে' এবং 'গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সোস্যাল ডেমোক্রেসির দুই কৌশল' বই তিনটির কথা উল্লেখ করতেই হয়।

কী করতে হবে? (১৯০১-০২)

পার্টিকে মতাদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে এই বইতে লেনিন কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। কমিউনিস্ট কর্মী হিসাবে প্রত্যেকের বইটি বারবার পড়া প্রয়োজন। এম বাসবপুন্নাইয়া এক আলাপচারিতায় জানিয়েছিলেন তিনি বইটি ৭০-৮০ বার পড়েছেন, আরো পড়তে চান। একটি দেশে কমিউনিস্ট পার্টি কীভাবে গড়ে উঠবে, তার মতাদর্শের ভিত্তি তৈরি করেছিলেন লেনিন। এই বইয়ে তার পরিচয় মেলে। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা এখানে উল্লেখ করতে চাই।

(১) শ্রমিকশ্রেণি—তার অর্থনৈতিক সংগ্রামের মধ্যে নিজেদের পাওনা গণ্ডা নিয়ে দরাদরি বা শ্রমশক্তি বিক্রির দর বাড়াবার কাজই—একমাত্র কাজ হতে পারে না। বরং যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা শ্রমিককে শ্রমশক্তি বিক্রি করতে, শোষিত হতে তাকে বাধ্য করছে সেই ব্যবস্থার উচ্ছেদ করতে চায় শ্রমিকশ্রেণি। যতদিন পুঁজিবাদের পাহারাদার থাকবে শাসকশ্রেণি ও তার রাষ্ট্রব্যবস্থা, তাকে উচ্ছেদ করেই সমাজতন্ত্র নির্মাণের পথ ছাড়া ভিন্ন কোনো উপায় নেই সর্বহারার—এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি লাভের।

(২) শ্রমিকশ্রেণির স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনকে বাহবা দেবার অর্থ পার্টির নেতৃত্বদানকারী ভূমিকাকে অস্বীকার করা। পার্টি কেবল ঘটনার পর্যবেক্ষক হয়ে থাকলে তা ব্যবস্থার 'লেজুড়ে' পরিণত হয়। এতে পার্টি কার্যত ধ্বংস হয়। আর এভাবে শ্রমিকশ্রেণিকে স্বতঃস্ফূর্ত ও নিরস্ত্র আন্দোলনে ছেড়ে দেওয়ার অর্থ—শ্রমিকশ্রেণির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা।

(৩) পার্টিকে ট্রেডইউনিয়ন আন্দোলনের মধ্যে সীমায়িত রাখলে তার মতাদর্শ ও চেতনাকে খাটো করা হয়। যে যন্ত্রের সাহায্যে পার্টি বর্তমানকে বুঝতে পারে এবং ভবিষ্যৎকে দেখতে পায় তাকে তাচ্ছিল্য করা হয়। এ প্রসঙ্গে তাঁর বিখ্যাত উক্তিটি প্রনিধানযোগ্য। ''বিপ্লবী নীতি না থাকলে বিপ্লবী আন্দোলন সম্ভব নয়। .....যে পার্টি সবচেয়ে অগ্রগামী নীতির দ্বারা পরিচালিত, সেই পার্টিই কেবল সংগ্রামে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করতে পারে।'' প্রচলিত বুর্জোয়া চেতনা শ্রমজীবীদের মধ্যে থেকে থাকেই, পার্টির কাজ বাইরে থেকে সমাজতান্ত্রিক চেতনা নিয়ে গিয়ে তা ছিন্ন করা। আর এই কাজটিই কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার প্রধান এবং আবশ্যক শর্ত। শ্রমিকশ্রেণির অগ্রণী ভূমিকা ও প্রলেতারিয় একনায়কত্বের প্রশ্নে তিনি কতটা আপসহীন ছিলেন এই বই-এর ছত্রেছত্রে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

এক পা আগে দু পা পিছে (১৯০২-০৪)

পার্টির সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তোলার প্রশ্নে প্লেখানভের সঙ্গে লেনিনের তীব্র মতাদর্শকগত দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। প্লেখানভ তত্ত্বগত খসড়ায় 'সর্বহারার একনায়কত্বকে' অস্বীকার করেন। ফলে শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লবী চরিত্র লঘু হয়ে যায়। লেনিন ইসক্রা পত্রিকার ২১ নং সংখ্যায় নিজস্ব পার্টি কর্মসূচি হাজির করেন—মার্কসবাদী তত্ত্বের ভিত্তিতে। এটি কেবল রুশদেশে নয় গোটা পৃথিবীর কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে গড়ে তুলতে ধ্রুবতারার মত পথ দেখায়। উল্লেখিত বইটিতে লেনিন সর্বহারার পার্টি গঠনের মূলনীতিগুলি ব্যাখ্যা করেছেন। সংক্ষেপে কয়েকটি বিষয় যা উল্লেখযোগ্য তা এখানে বলা হলো। এই বইটি সকল বামপন্থী কর্মীদের পড়া অবশ্য প্রয়োজন।

(১) মার্কসবাদী পার্টি শ্রমিকশ্রেণির অগ্রণী বাহিনী। এই বাহিনী শ্রমিকশ্রেণির অনান্য বাহিনী থেকে পৃথক। এই বাহিনী শ্রেণি চেতনায় উদ্বুদ্ধ, প্রলেতারিয়েতকে নেতৃত্ব দিতে পারে।

(২) পার্টি শ্রমিকশ্রেণির শৃঙ্খলাপরায়ণ সুসংহত বাহিনী। পার্টি কতকগুলি শ্রমজীবী, ধর্মঘটী বা মার্কসীয় তাত্ত্বিকের সমাহার নয়, শ্রমিকদের কোনো না কোনো সংগঠনে কাজ না করে পার্টিসভ্যের গৌরব বহন করা একটি অভিজাততান্ত্রিক বিচ্যুতি। পার্টিকে সম্মিলিত ইচ্ছার প্রতীক হয়ে কাজ করতে হবে।

(৩) পার্টি শ্রমিকশ্রেণির সর্ব সংগঠনের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সংগঠন। রাষ্ট্র দখল শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বদানকারী একমাত্র সংগঠন হলো পার্টি।

(৪) পার্টি লক্ষ লক্ষ জনসাধারণের সাথে শ্রেণি সম্পর্কের অগ্রগামী বাহিনীর মূর্ত প্রতীক। যে পার্টি নিজেকে শামুকের খোলার মধ্যে গুটিয়ে রাখে সেই পার্টি আসলে জনবিচ্ছন্ন। এই পার্টি মানুষের বিশ্বাস হারায়, মর্যাদা হারায় ও শেষে ধ্বংস হয়।

(৫) পার্টিকে সুসংহতভাবে কাজ করতে হলে 'কেন্দ্রিকতার নীতির উপর দাঁড় করাতে হবে।'

সংখ্যাগরিষ্ঠের মত সংখ্যালঘুকে মানতে হবে। যেখানে সাংগঠনিক ভাবে ব্যক্তি সমষ্টির অধীন। নিম্নস্তরগুলি উচ্চস্তরের অধীন।

(৬) এই শৃঙ্খলা হবে সর্বহারা সুলভ। সেখানে অভিজাততান্ত্রিক উশৃঙ্খলতা থাকবে না। পার্টি কর্মীদের মালিকের দৃষ্টিতে শ্রমিক জ্ঞান করা চলবে না। শৃঙ্খলা মেনে চলাকে দাসত্বের চোখে দেখাটা সম্পূর্ণ অমার্কসীয়। নীতি ও শৃঙ্খলা সকলের জন্য সমান। কেউ শৃঙ্খলার উর্ধ্বে নন।

'সোস্যাল ডেমোক্রেসির দুই কৌশল' বইটিতে লেনিন বিপ্লবের পথে কমিউনিস্টদের কৌশলগত দিকগুলি বর্ণনা করেছেন। রণনীতি ও রণকৌশলের মধ্যে উপযুক্ত তফাৎ করতে না পারলে বিপ্লবী পার্টি জযযুক্ত হতে পারেনা। এই ভাবে ধাপেধাপে তিনি এক কঠোর কঠিন শৃঙ্খলাপরায়ণ পার্টি কাঠামো গড়েছিলেন বলেই রুশ বিপ্লবের মত অসাধ্যসাধক কাজ করা রুশ সোস্যাল ডেমক্রাটিক পার্টির পক্ষে সম্ভব হয়েছিল।

১৯০৫ থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত লেনিনকে বহুবার প্লেখানভ, মার্তভদের সঙ্গে এনিয়ে সংগ্রাম চালাতে হয়েছে। আবার বিপ্লবের প্রশ্নে তাদের নিয়ে একসঙ্গে কাজ করতে হয়েছে। এর জন্য লেনিনকে ঝগড়াটে, ঘোঁট পাকানোর ওস্তাদ, উপদলীয় কাজে সিদ্ধহস্ত, পেশাদার দলবাজিকরা লোক, ইত্যাদি বহু বিশেষণে বিদ্ধ হতে হয়েছে।

স্তালিন এই প্রসঙ্গে বলেছেন—আসলে লেনিন বিভ্রান্তিকর ও সুবিধাবাদী মত যাতে পার্টির ভিতর প্রতিষ্ঠা না পায় তার জন্য আগাম অনুমানের ভিত্তিতেও বহু ঘটনাকে সামনে টেনে নিয়ে এসে তার আগাম সমালোচনা করতেন। এতে অনেকে বিরক্ত হতেন। আসলে পার্টিকে মতাদর্শ ও সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী করার কাজে তিনি বিন্দুমাত্র ফাঁক রাখতেন না। প্রয়োজনে আগাম সমালোচনা করে হুঁশিয়ারি করতেন।

অধ্যাপক, স্কুলের ছাত্র, দরদি বা ধর্মঘটী এরকম সকলকে পার্টি সদস্যের পদবি দিয়ে দিলে তার পরিণাম যে ভালো হয় না তা লেনিন বুঝেছিলেন। তাই মেনশেভিকদের 'পার্টির দরজা' হাট করে খুলে দেবার অপপ্রয়াস,একাজে সামান্যতম শিথিলতার বিপদজনক পরিণাম বুঝেই তিনি পার্টিকে ইস্পাত-দৃঢ় করতে চেয়েছিলেন। অর্থাৎ পার্টির অন্তর্ভুক্তির প্রশ্নে তিনি ছিলেন দৃঢ়। পার্টির ভিতরে আমলাতান্ত্রিকতা, গতানুগতিকতা, কারো কোনো অতীত কাজের দৌলতে অভিজাত হয়ে ওঠার প্রচেষ্টা, পার্টির শৃঙ্খলার বনিয়াদকে কীভাবে ধ্বংস করে তা তিনি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। পার্টির মধ্যে সর্বোচ্চ গণতন্ত্র, সমালোচনা, আত্মসমালোচনার নীতি দৃঢ়ভাবে গড়ে তুলতে না পারলে, সকলে সমানভাবে তার যোগ্য না হয়ে উঠলে, যে ভারসাম্যহীনতা তৈরি হয়, তা ভিতর থেকেই পার্টিকে বরবাদ করে দেয়। বাইরের বলপ্রয়োগের অপেক্ষা রাখে না।

রাশিয়ার এক কঠিন সময়ে বিপ্লবের প্রস্তুতির প্রেক্ষাপটে উচ্চারিত লেনিনের এই কথাটি মনে করিয়ে দিই। 'লোক নাই, তবু অসংখ্য লোক আছে।' লোক নাই মানে—আমাদের রাজনৈতিক নেতা নাই, কাজ করার কর্মী নাই, জনগণের উপর প্রভাবশালী সংগঠন নাই। আর লোক আছে মানে—প্রতিবাদী মানুষ আছে, তারা যন্ত্রণাক্লিষ্ট, অত্যাচারিত। তারা লড়াই করতে চায়। স্বৈরশাসনের অবসান চায়। কাজেই পরিস্থিতি অনুকূল, কিন্তু প্রস্তুত নয় পার্টি। তাই পার্টিকে প্রস্তুত রাখা একটা প্রধান গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

কাজেই লেনিনের পার্টি গড়ার অভিজ্ঞতা থেকে আজও বিশ্বের কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে শিখতে হবে। লেনিনের দেখানো পার্টি গঠনের প্রধান নীতিগুলি যথাযথ প্রয়োগর মাধ্যমেই প্রার্টিকে গড়ে তুলতে হবে। নচেৎ ফাঁকি দিলে পরবে ফাঁকে। ভুরিভুরি ফাঁকে পরার উদাহরণ—পৃথিবীর কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাসে কিন্তু রয়েছে।

নভেম্বর বিপ্লব

১৯১৭ সালে দুটি পর্যায়ে বিপ্লব সংগঠিত হয়েছিল। দুই স্তরের বিপ্লব। প্রথমটা ফেব্রুয়ারি মাস, দ্বিতীয়টা নভেম্বর মাসে। ফেব্রুয়ারি তে হয়েছিল মূলতঃ জারতন্ত্রের উচ্ছেদ। সামন্তবাদের উচ্ছেদ হলো। জার নিজেই ৮০ লক্ষ হেক্টর জমির মালিক ছিলেন। অভিজাত, উচ্চ জমিদার শ্রেণি ও তার মাথায় থাকা জারতন্ত্রের উচ্ছেদ একটা প্রধান সমস্যার সমাধান হলো ঠিক, কিন্তু লেনিন আহ্বান জানালেন-এখানে থামলে হবে না। আরো এগিয়ে যেতে হবে। নতুন তৈরি হওয়া বুর্জোয়া কেরেনিস্কি সরকারের কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে গ্রাম-শহরের সোভিয়েতের হাতে তা দিতে হবে।

নতুন শ্লোগান

এই সময় লেনিন শ্লোগান তোলেন—শান্তি, জমি রুটি ও স্বাধীনতার। যুদ্ধে রণক্লান্ত সৈনিকদের জন্য শান্তি, ভূমিহীন কৃষকদের জন্য জমি, ক্ষুধার্ত শ্রমিকদের জন্য রুটি এবং সোভিয়েত হাতে ক্ষমতা। এই সময় লেনিন রচনা করলেন—'এপ্রিল থিসিস'। 'সোস্যাল ডেমক্রাসির দুটি কৌশল' ব্যাখ্যা করে তিনি দেখালেন রাশিয়ায় পুঁজিবাদী ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। এই পুঁজিবাদের উচ্ছেদ করবে গ্রাম ও শহরের সর্বহারা শ্রেণি। তাই এগিয়ে যেতে হবে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দিকে।

লেনিনের ভাবনায় এই অভ্যুত্থান হবে শিল্পকর্মের মতো। নিখুঁত, প্রায় রক্তপাতহীন, অথচ সাহসী। দুনিয়া কাঁপানো ১০ দিনেই তাই ক্ষমতা দখল করেছিলো শ্রমিকরা। কেরেনিস্কি সরকারের পতন হয়েছিল। একটা বিশাল দেশে বিপ্লব হয়েছিল ১০ দিনে। কিন্তু বিপ্লবকে ধরে রাখতে ১০ সাম্রাজ্যবাদী দেশের বিরুদ্ধে চালাতে হয়েছিলো ৭ বছর ধরে লড়াই। যুদ্ধ বন্ধ করে দেশের মানুষের কাছে শান্তি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। জমির ডিক্রি জারি করে সমস্ত জমিদারদের জমি বাজেয়াপ্ত করে তা গরিব কৃষকের মধ্যে বন্টনের ব্যবস্থা করলেন। সকলের শিক্ষা স্বাস্থ্য, গ্রামে বিদ্যুত, খনি ও কারখানায় উৎপাদনের প্রতিযোগিতা, নারীর অধিকার ও সাম্য প্রতিষ্ঠা করা হলো।

পরবর্তীকালে অর্থনীতি ক্ষেত্রে সামরিক সাম্যবাদ (war communism) নীতি প্রত্যাহার করে লেনিন কৃষকদের জমির উদ্বৃত্ত ভোগের অধিকার ফিরিয়ে দিলেন। চালু হলো নতুন অর্থনৈতিক কার্যক্রম (NEP)। লেনিনের লেখা 'Notes of a Publicist' (ফেব্রুয়ারি, ১৯২২) বইটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সমাজতন্ত্র নির্মাণের স্বার্থেই লেনিন যে একাজ করেছিলেন তা বোঝা যায়। এটি ধনতন্ত্রে ফিরে যাওয়া নয়, বরং এক পা পিছিয়ে দু পা এগিয়ে যাবার কৌশল। তখন পুঁজির বিকাশের প্রয়োজনে সমাজতন্ত্রে বাজার অর্থনীতি এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার কাজ চলছিলো। সেই পরিপ্রেক্ষিতে বইটি লেখা।

এ প্রসঙ্গে লেনিন বলেছেন, একজন পর্বতারোহীকে একটি উঁচু পর্বতের শিখরে উঠতে বহু চড়াই উৎরাই পার হতে হয়। এই পথ পার হওয়াটা মোটেই ক্লেশকর নয়। ক্লেশকর হয় তখন, যখন অনেকটা পথ উঠে আসার পর দেখা যায় শিখরে ওঠার সব পথ বন্ধ। তখন আবার নেমে আসতে হয়। আবার পুনরায় শুরু করতে হয়। এই সময় তীব্র সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয়। এই সময় বলা হয়—''ঐ দেখো ভুল করেছে। সে পড়ে যাবে। সে পিছু হটছে, ঐ পথ ভুল পথ।'' লেনিন তখন বলেছেন—কমিউনিস্টদের এমন ভ্রান্ত ধারণা থাকা উচিৎ নয়, যাতে হতাশায় তারা পর্যুদস্ত হয়। কঠিন সময়ে কমিউনিস্টদের নানাবিধ নমনীয়তায় নিজস্ব শক্তিকে তখন মজুত রাখতে হয়। বাম সম্ভাবনা কখনো নিঃশেষিত হয় না। কমিউনিস্টদের জানতে হয়—''কেমন করে শুরুর থেকে শুরু করতে হয়, বারংবার।'' কোনো বিপ্লবী তার অসমাপ্ত কাজের প্রক্রিয়া পূর্ব প্রচেষ্টার শেষ পর্যায় থেকে শুরু করবে না। সে 'শুরু করবে -শুরুর থেকে শুরু'। সমাজতন্ত্রের অগ্রগতির নানাবিধ পথে কোনো ধ্বংসাত্মকতা থাকে না। থাকে সৃজনশীলতা। নতুন নতুন পথের সন্ধান। লেনিন নভেম্বর বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে মার্কসবাদের সেই সৃজনশীল নবনির্মাণ ঘটিয়েছিলেন।

বিপ্লবের স্ফুলিঙ্গ

এভাবে ঘরে বাইরে সব ষড়যন্ত্র, প্রতিবিপ্লবকে বিনাশ করে লেনিন গড়ে তুললেন এক নতুন দেশ। সর্বত্র যৌথ খামার চালু হলো। ইস্পাত উৎপাদন, গম উৎপাদনে অল্প সময়ে আমেরিকাকে ধরে ফেলা সম্ভব হলো। কায়িক শ্রম বিশেষ মর্যাদার আসন পেলো। সব ক্ষমতা সোভিয়েতের হাতে পৌঁছালো। স্টাখানভ নামক এক শ্রমিক খনিতে রেকর্ড উৎপাদন করে যে নজির গড়েছিলো তাকে সম্মান জানিয়ে তৈরি 'স্টাখানভ আন্দোলন' দেশপ্রেমী মানুষের ভূমিকা পৃথিবীর বুকে নতুন দৃষ্টান্ত তৈরি করল।

তাই রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ার চিঠিতে লিখলেন—এখানে কোথাও 'ধনগরিমার ইতরতা' দেখিনি।

তাহলে কোথাও এই ইতরতা আছে? উনি কোনো দেশের নাম বলেননি। তবে কোন দেশ, কোন ব্যবস্থা, বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। কারণ সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার তখন তাঁর চোখে 'তীর্থস্থান'।

১৯০৭ থেকে ১৯১৭ সালের প্রথম দিক পর্যন্ত লেনিন রুশ দেশের বাইরে থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন। ফিরে আসেন ১৯১৭ সালের ১৬ এপ্রিল। তবু তিনি যেখানেই থেকেছেন সেখান থেকেই বিপ্লবের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। পার্টির অভ্যন্তরে বাকি সর্বস্বদের মতাদর্শগত

—এরপর চারের পাতায়

পণ্ডিত তারানাথের ২০৯ তম জন্মদিবস পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৪ নভেম্বর : ভারতবিখ্যাত পণ্ডিত কালনার ভূমিপুত্র তারানাথ তর্কবাচস্পতির ২০৯ তম জন্মদিবস পালিত হল। কালনা শহরের তেতুঁলতলা মোড়ে পণ্ডিত তারানাথ তর্ক বাচস্পতির মূর্তিতে মাল্যদান, পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন ও ছাত্রছাত্রীদের হাতে শিক্ষার উপকরণ, মাস্ক, স্যানিটাইজার প্রভৃতি তুলে দেওয়া হয়। হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও। মূর্তিতে মাল্যদান করেন—অধ্যাপক ধনঞ্জয় ঘোষাল, বিধায়ক দেবপ্রসাদ বাগ, সিদ্ধেশ্বর আচার্য, ডাঃ কৃষ্ণচন্দ্র বড়াই, সাহিত্যিক তরুণ সেন, শিক্ষিকা স্বাগতা কর্মকার প্রমুখ। তারানাথের জন্ম ১৮১২ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে। বাবার টোলের পাঠ শেষ হলে তারানাথ কলকাতার সংস্কৃত কলেজে পাঠ নিতে যান। সেখানে ছাত্রাবস্থায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে পরিচয় ও বন্ধুত্ব ঘটে। তিনি অলংকার (১৮৩০), ন্যায় (১৮৩১), কাব্য ও বেদান্ত (১৮৩৫) পাঠ সমাপ্ত করেন। এছাড়াও কাশী ও অন্যান্য স্থানে নানারকম পাঠ নিয়ে কালনায় ফিরে এসে টোলে অধ্যাপনা শুরু করেন। পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন ব্যবসা শুরু করেন। এদেশের প্রায় বারোশো তাঁতিকে দিয়ে কাপড় বুনিয়ে তা দেশ-বিদেশের বাজারে চালান দিতেন। বীরভূমে ৫০০টি গাই কিনে ঘি-এর ব্যবসা করেন। শেষের দিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ঐকান্তিক আগ্রহে কালনার অধ্যাপনা ও ব্যবসা বণিজ্য ছেড়ে কলকাতা সংস্কৃত কলেজে মাসিক ৯০ টাকা বেতনে অলংকার শাস্ত্রের অধ্যাপক-এর পদ গ্রহণ করেন। পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেই পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কালনায় এসেছিলেন।

শুধু অধ্যাপনায় নয়, বহু সমাজ সংস্কারমূলক কাজেও তিনি অংশীদার ছিলেন। স্ত্রীশিক্ষা, বিধবাবিবাহ, বাল্যবিবাহ রোধ প্রভৃতি সংস্কারমূলক কাজে তিনি ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পরামর্শদাতা ও সহায়ক সৈনিক হয়ে উঠেছিলেন। কলকাতায় অধ্যাপনার কাজ ছেড়ে দিয়ে শেষ জীবনে কাশিতে গিয়ে বসবাস শুরু করেন। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের ২০ জুন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যু খবর পেয়ে ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বলেছিলেন-- 'ভারত আজ পণ্ডিতশূন্য হইল'।

আর্থিক অনটনেও সাফল্য মেধাবী এজারুদ্দিনের

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ৪ নভেম্বর : একদিকে আর্থিক অনটন, অপরদিকে বাবা-মার সংস্পর্শ না পাওয়া এজারুদ্দিন শেখ সাফল্য পেল সর্বভারতীয় ডাক্তারি পরীক্ষায় (নিট)। অনুকূল পরিবেশ, উপযুক্ত পরিস্থিতি না থাকলেও যে সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছানো যায়, তা করে দেখালো পূর্বস্থলী -১ পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত বগপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘোলা গ্রামের এই ছেলেটি। মাধ্যমিকে ভালো নম্বর তুলেও পয়সার অভাবে ভিন রাজ্যে সোনা-রুপার কাজ করার মনস্থির করে ফেলে এজারুদ্দিন। কিন্তু সমাজকর্মী বুলবুল শেখ তার ভিন রাজ্যে যাওয়া বন্ধ করে দিয়ে তাকে মেমারির মামুন মিশনে ভর্তি করান। সেখানে সাফল্যের সঙ্গে দ্বাদশ শ্রেণী পাস করার পর এজারুদ্দিন স্থির করে সে ইঞ্জিনিয়ারিং-এর প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসবে। কিন্তু সমাজকর্মী বুলবুল শেখ তাকে ডাক্তারি প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসার

জন্য কলকাতার পতাকা শিল্পগোষ্ঠী পরিচালিত জিডি স্টাডি একাডেমিতে ভর্তি করে দেন। তার আর্থিক অবস্থা এবং মেধা দেখে এই একাডেমি বিনা ব্যয়ে কোচিং দেওয়ার ব্যবস্থা করে। মাত্র ৭/৮ মাস কোচিং নিয়েই এজারুদ্দিন সাফল্য পায় সর্বভারতীয় ডাক্তারি প্রবেশিকা পরীক্ষায়। তার প্রাপ্ত নম্বর ৭২০-র মধ্যে ৬০০।

প্রান্তজন—আত্মজন (২৭)

রত্না রশীদ

গণেশ হলেন প্রান্তজনের আত্মজন। মোটেই কোনো বড়লোকের উপাস্য নয়। অথচ আমরা আজকের এই সভ্যতার সঙ্কটে ঠিক তার উল্টো চেহারাই দেখতে পাচ্ছি। গণেশ নিয়ে মাতামাতি করলেই যদি সর্বসিদ্ধি লাভ হতো, তাহলে আজ আমাদের দেশটার এই দুঃখী চেহারা তৈরি হতো না। পুজোয় কিচ্ছুটি হয় না, যা করতে হয় তা নিজের হাতে। কর্মবিহীন পুজো নিষ্ফল। জগন্নাথ দর্শন করতে লোকজন কী করতে যায় সে জানে! ভক্তির প্রাবল্যে দেখতে পায় না জগন্নাথের ঠুঁটো হাত এই বার্তা দিচ্ছে যে, যা করণীয় তা মানুষকে নিজ হাতেই করতে হবে। আপনা হাত জগন্নাথ।

অনেক দেবদেবীর কথা হলো। এবার পুজোটুজো জড়িয়ে আগে পিছে অনেক রিচ্যুয়ালস্। দুর্গাপুজোর আগে মহালয়ায় পিতৃতর্পণ, পুজোর পর প্রায় এক মাস ধরে বিজয়া চলবে। আত্মীয়স্বজন, পাড়া প্রতিবেশীদের আনাগোনা চলবে। বাড়িতে আনন্দের হাট। আমাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতা যে তলানিতে ছিল, তা কখনো মা-দিদা বুঝতে দেয়নি।

তখন, সেই ছোটবেলায়, আমরা দুর্গাপুজোর পর পুরো একটা বিকেলে জলখাবার খেতাম না, মা-দিদা হাজারবার সাধলেও না। আমাদের বন্ধুদের মধ্যে গোপন খবর থাকতো, কবে কাদের বাড়িতে মাংসের ঘুগনী হবে, কবে হবে কাজুকিসমিস দেওয়া পায়েস, কাদের বাড়িতে কলকাতা থেকে টমেটো, মটরশুঁটি, সাবু, চাল, চিংড়িমাছের পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের পাঁপড় আনা হয়েছে বিজয়ায় খাওয়াবার জন্য, সব খবর তাদের বাড়ির ছেলেমেয়েরাই বাড়ি বয়ে এসে দিয়ে যেতো, সঙ্গে করে নিয়েও যেতো আমাদের। ওই সঙ্গে আমাদের বাড়িতে বিজয়া সেরে যেতো কুচো নিমকি, নারকেলনাড়ু খেয়ে। যেদিন যেমন ইচ্ছে, যার খুশি বাড়িতে ঢুকে পড়লেই হলো—বিজয়ার সঙ্গে ভুরিভোজ। একদিনে দু-তিনটে বাড়ির বেশি হয়ে গেলে, একটু অসুবিধা হতো। পেটে জায়গা থাকতো না। মুস্কিল হতো, আগে যে দুটো বাড়ি ভেবে রেখেছি, তারওপর আবার যেচে নেমন্তন্ন হলে, ...এই তোদের জন্য আজ উদয়ন থেকে ভেজিটেবল চপ আনানো হবে, আসবি যেনো, ...এই আজ আমাদের বাড়ি মাংসের ঘুগনি করবো, অবশ্য অবশ্য আসবি যেনো,....এই আজ আমাদের বাড়িতে খাঁটি দুধের ক্ষীর করবো, আসবি কিন্তু—এইসব কাকিমা-জ্যেঠিমাদের নির্দিষ্ট করা নিমন্ত্রণ নির্দিষ্ট দিনেই তো যেতে হবে। আগে আমাদের ঠিক করা বাড়িগুলো ক্রমশ পিছিয়ে পিছিয়ে যায়। তার মধ্যে হুট্ করে এসে পড়তো লক্ষ্মীপুজো। আমাদের বাড়িতে পুজোটুজো হতো না। এর ওর বাড়িতে হাজার রকম ফল মিষ্টি প্রসাদ ভোগ খেয়ে পেট আইঢাই। তার ওপর বাড়ি বয়ে দিয়ে যেতো অনেক অনেক প্রসাদ আর খিচুড়ি ভাজা পায়েস ভোগ। রাতের রান্না-বান্না মা'কে করতে তো হতোই না, সকালে উঠেও ভোগপ্রসাদ খেতাম আমরা। তারপর বেশ ক'টা দিন একদমই ফাঁকা—কবে যে কালীপুজো দেখতে গিয়ে ক্যালেণ্ডারের দুটো লাইন পেরিয়ে যেতো।

কালীপুজোর প্রস্তুতিতে চোদ্দ শাক ভক্ষণ আর চোদ্দ প্রদীপের আলো জ্বালা। আমাদের ছেলেবেলায় দিওয়ালী, ধনতেরাস এসব শব্দ আবিষ্কৃত হয়নি। চোদ্দশাকের দিন আমি আর ভাই আশপাশের মাঠ ঘুরে ঘুরে শাক খুঁজে আনতাম। বাজারে তখন এসব বিক্রি হতো না। আর আমরাও খুব কিছু শাক চিনতাম না। যা পেতাম দুটো একটা করে তুলে তুলে ছোটো থলিতে ভরতাম। পরে মা বাড়িতে ওগুলো চিনে চিনে বেছে তুলে নিতো। চোদ্দরকম শাক পাওয়া কি মুখের কথা। পাশের বাড়ির কাকিমার সঙ্গে হয়তো মা দুটো একটা পাল্টাপাল্টি করে নিলো। তাতেও হয়না চোদ্দো রকম শাক। শেষকালে বাঁধাকপি পাতা, ফুলকপির পাতা, ধনে পাতা জুড়ে যদি হলো তো ভালো, নইলে দাও দুটো দুব্বো ফেলে। গরু ছাগল খেতে পারলে আমরা কেন পারবো না!

দিদা বলতো, চোদ্দ শাক কোন্ কোন্ শাকের সম্মিলন তা নির্দিষ্ট করা আছে। ওল, বেতো, সর্ষে, কালকাসুন্দে, নিম, হিঞ্চে, শুশনী, ভাঁটপাতা, এইসব নিয়ে চোদ্দরকম শাক। অতো পাবি কোথায়! চোদ্দরকম না হলেও হবে। অনেকগুলো শাক একসঙ্গে মিশিয়ে খেলে সেটাই শরীরের পক্ষে ভালো। ধনেপাতা, কপিপাতা, বেগুনপাতা, দুব্বো—এসব মিশিয়ে চোদ্দ করার কোনো প্রয়োজন নেই।

আর হলো চোদ্দ প্রদীপ। মা নিজে মাটির প্রদীপ গড়ে উনুনে পুড়িয়ে নিতো। তারপর জলে ভিজিয়ে নিয়ে প্রদীপে তেল ঢেলে জ্বালাতো। নইলে সব তেল শুকনো প্রদীপ চোঁ চোঁ করে টেনে নেবে যে! (চলবে)

লেনিনের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন

—তিনের পাতার পর

ভাবে পরাজিত করে রাখলেন বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের রূপরেখা।

তাই সাইবেরিয়ার লেনা নামক মহানদীর নাম থেকে শুধু লেনিন নাম নয়, তাঁর দেখানো পথে উজান নদীর স্রোতে বিপ্লবের নৌকা ভাসিয়েছে আজ পৃথিবীর সব দেশের সর্বহারারা। তিনি কেবল প্রথম সফল বিপ্লবের রূপকার নন একসাথে সফল সর্বহারা পার্টি গড়ে তোলারও তিনি প্রধান পথিকৃত।

তাই, নভেম্বর বিপ্লব শুধু ইউরোপে নয়, গোটা দুনিয়ার শ্রমজীবী মানুষের প্রেরণা। নতুন আদর্শের দিকদিশারী। মার্কসবাদী তত্ত্বের প্রথম ফলিত প্রকাশ। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন সর্বত্র নতুন প্রেরণার জন্ম দিল এই বিপ্লব। রবীন্দ্রনাথ থেকে রোমাঁ রোলাঁ, আইনস্টাইন থেকে আঁরি বারবুস, জর্জ বার্নার্ড'শ থেকে বাট্রান্ড রাসেল। অরোরা জাহাজের কামানের গোলায় কবি, সাহিত্যিক, জ্ঞানী, গুণী, শিল্পী, বিজ্ঞানী, দার্শনিক সহ জারের শীতপ্রাসাদে জেগে উঠলো বিশ্ব সভ্যতা। খুঁজে পেলো নতুন এক পৃথিবীর সন্ধান।

শিক্ষকনেতার জীবনাবসান

—প্রথম পাতার পর

আগে অবস্থার অবনতি হলে কালনা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ও পরে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়। মৃতদেহ কলকাতা থেকে কালনা শহরের কালনা মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার দপ্তর, সিপিআই(এম) কালনা এরিয়া কমিটির দপ্তর, নেতাজি স্কাউট, দিপালী সংঘ হয়ে তাঁর জাপটের বাড়িতে পৌঁছায়। সিপিআই(এম) কালনা শহর এরিয়া কমিটির পক্ষ থেকে তাঁর মরদেহ রক্ত পতাকায় মুড়ে ও মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। শ্রদ্ধা জানান সিপিআই(এম) নেতা স্বপন ব্যানার্জি, বীরেন বসুমল্লিক, অরুণাভ চক্রবর্তী, কেশব ঘোষ প্রমুখ। শিক্ষক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তিনি পার্টির সংস্পর্শে আসেন। ২০০৫ সালে পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। শেষজীবন পর্যন্ত সেই পদেই আসীন ছিলেন। তিনি ক্রীড়া জগতে খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। ফলে দীর্ঘদিন কালনা মহাকুমা ক্রীড়া সংস্থার সম্পাদকের পদ সামলেছেন। এছাড়াও বিভিন্ন ক্লাবের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি কৃষ্ণদেবপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেছেন। তাঁর স্ত্রী ও দুই পুত্র বর্তমান।

নাম/পদবী পরিবর্তন

☐ আমি Surja Narayan Paul S/o Late Shyamsundar Paul, বোরহাট কালীতলা, বক্সিরাম মারওয়াড়ি লেন, পোঃ নতুনগঞ্জ জেলা—পূর্ব বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট পূর্ব বর্ধমানের নিকট ১ নভেম্বর ২০২১ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে আমার পিতার নাম Shyamsundar Paul যা আমার সমস্ত নথিতে নথিভুক্ত আছে, কিন্তু আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB41200-5100006-তে আমার পিতার নাম ভুলবশত Shyam Kumar Paul নথিভুক্ত হয়েছে। Shyamsundar Paul ও Shyam Kumar Paul এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

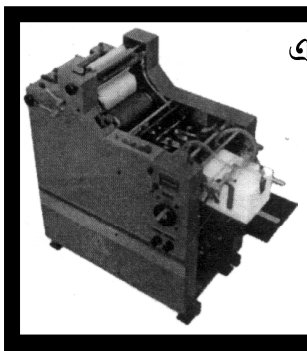

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান

Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com

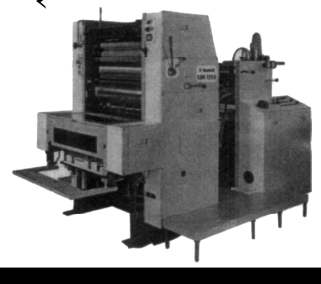

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। বার্তা সম্পাদক : দিনেশ ঝা। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক দিনেশ ঝা কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন : ৯৪৩৪২৫১৫৮৬। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪। মূল্য : ২ টাকা